কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড : ১৪, সংখ্যা : ১৯, জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
DOI:

নজরুলের গল্প ‘রাক্ষুসী’ : লোকসাংস্কৃতিক ও মানব-মনস্তাত্ত্বিক পরিসরে নারীভাবনার বিনির্মাণ

তাশরিক-ই-হাবিব*

Abstract: Kazi Nazrul Islam is widely known and well accepted in Bengali literature primarily as a poet and lyricist. However, he began his literary career as a storyteller. As a creative writer, his inclination towards stories is comparatively less, so he has presented eighteen stories to the readers in three books. The fundamental identity of the Bengali nation and the identity of the mass people are reflected in diverse ways in his stories. One of his most successful stories is 'Rakkhushi', which is about the Bagdi community of Birbhum, West Bengal. Nazrul's focus on women's thoughts, combined with the unique lifestyle of this marginalized community, their love for folk culture, and family and social context, gives the story its uniqueness. In patriarchal society, the subservient and dependent view of women, and the traditional reality of performing household chores while maintaining the veil within the family circle, persisted until the second decade of the 20th century. Its completely opposite character in this story clarifies Nazrul's new outlook on women's life and self-assured position as an integrated art form devoid of emotions and human values. In the folk cultural and psychological realm, Nazrul has taken the central theme of the story to embody the existential crisis of the Bagdi woman, who is marginalized in a patriarchal society and her resistance to traditional patriarchal domination. That is why the relevance of presenting this significant yet unexplored issue in the present article is important.

১. ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রধান পরিচিতি কবি ও গীতিকার হিসেবে। তবে গল্পকার হিসেবেও তিনি সৃষ্টিশীল সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সংখ্যায় স্বল্প হলেও তাঁর কিছু গল্প বিশিষ্টতার দাবিদার। নজরুলের গল্পে সমাজবাস্তবতার বিশ্বস্ত রূপায়ণ লক্ষণীয়। অবিভক্ত ভারতের গ্রামীণ জনজীবনের পরিচয় গল্পে উপস্থাপনে তিনি সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও পরিণত জীবনাভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। নারী-পুরুষের আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসে তাঁর অভিনিবেশ ও শিল্পভাবনার প্রতিফলন সমকালীন সমাজবাস্তবতার আলোকে বাঙ্ময় হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা বরাবর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও অধীনতার মানদণ্ডে নির্ধারিত হয়। পারিবারিক অনুশাসন, ধর্মীয় রীতি-নীতি, মূল্যবোধের পাশাপাশি সামাজিক প্রথাসমূহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নজরুলের সাহিত্যকর্ম গণমানুষের উৎকর্ষসাধন, সৃজনশীলতা ও মনন বিকাশে সহায়ক ছিল। তাই তাদের কাছে সমাদৃত লোকসাহিত্য ও পুরাণের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, বিষয়, চরিত্র ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহকে তিনি গল্পে নবরূপে ধারণ করেছেন। সমকালীন সমাজবাস্তবতার সঙ্গে লোকঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটিয়ে নজরুল মানবজীবনের শাশ্বত সত্য ও আদর্শকে রূপায়িত করেছেন বিভিন্ন গল্পে। এক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল গল্প হিসেবে ‘রাক্ষুসী’ উল্লেখযোগ্য। এতে লোককথা ও পুরাণের বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র ও প্রসঙ্গের আলোকে নারীভাবনার বিনির্মাণ[১] বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ গল্পে নারীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যথাসম্ভব পূর্ণায়ত, সর্বাঙ্গীন

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং মানবিক আবেদনগুণে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। মানবস্বভাবের শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ, নৈতিকতা-স্খলন, উত্থান-পতন, সৃজন-বিনাশ প্রভৃতি যুগ্ম-বৈপরীত্যমূলক[২] সংবেদনারাশির শৈল্পিক ভাষ্যদানে তিনি যথাসম্ভব সংযত, বাস্তবানুগ ও নৈর্ব্যক্তিকতার অনুসারী। নারীই মানবসভ্যতার ধারক ও বাহক, নজরুলের ভাষ্যে কল্যাণী ও মহিয়সী। অথচ বাঙালি সমাজে তার অবস্থান বরাবর অপর[৩] হিসেবে বিবেচিত। নজরুল এ গল্পে প্রান্তিক এক বাগদি[৪] গৃহবধূর জীবনসংগ্রাম ও তার পরিবারের সঙ্গে বাগদি সমাজের লড়াইয়ের বৃত্তান্ত উপস্থাপনে নারীকেন্দ্রিক গতানুগতিক, রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিহার করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে নারীর চিরাচরিত কল্যাণময়ী, সেবাব্রতী ভাবমূর্তির সমান্তরালে তার অনমনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অপরাজেয় জীবনবীক্ষাকেও তুলে ধরেছেন।

১.১ 'রাক্ষুসী' গল্পের ঘটনাধারার সঙ্গে কুশীলবদের সংযোগসূত্র

কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম প্রতিনিধিত্বশীল গল্প 'রাক্ষুসী'। বিষয়বস্তু বিবেচনা ও আঙ্গিক প্রকরণ – উভয় মানদণ্ডে এর শিল্পসাফল্য[৫] অতুলনীয়। অসাধারণ পরিমিতিবোধ ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী বিষয় নির্বাচনের গুণে গল্পটির মানবিক আবেদন কালজয়ী মহিমায় উত্তীর্ণ। সম্ভবত এটিই নজরুলের একমাত্র গল্প, যেখানে তিনি কায়িক শ্রমজীবী বাগদি সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা ও জীবিকাধারণ পদ্ধতি, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি, নারী-পুরুষের আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাস, লোকসাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গসমূহ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক অনুদঘাটিত ভুবনকে আবিষ্কার করেছেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো তাদের ভাষিক পরিমণ্ডল। বাংলা ভাষার সক্রিয় প্রভাবযুক্ত বাগদি ভাষার প্রয়োগে কুশীলবদের সংলাপ গ্রন্থনায় নজরুল অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। পুরুষের পাশাপাশি বাগদি নারীও সাংসারিক কর্মকাণ্ড, জীবিকানির্বাহে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান বরাবর পশ্চাৎপদ ও পরনির্ভরশীল বিবেচিত হলেও এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গৃহবধূ বিন্দির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল বিপ্রতীপ। স্বামীর সংসারে থাকলেও তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে বিন্দি নিজেই অর্থ উপার্জনের বন্দোবস্ত করেছিল। গৃহিণীর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি মা হিসেবে সে তিন ছেলেমেয়েকে যথাসাধ্য প্রতিপালন করত। স্বামীর প্রতি তার একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা পদদলিত হওয়ায় সে এর প্রতিকারে পরিণতিতে তাকে খুন করতে বাধ্য হয়। খুনী হিসেবে তার দায়বোধ যতটা নিজের প্রতি, ততটা সমাজের কাছে নয়। কারণ দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারটিকে সে অন্যদের কাছে প্রকাশ করতে চায়নি। তবে ব্যাপারটি একপর্যায়ে সর্বসমক্ষে জানাজানি হয়। ফলে, বিন্দিও কারাভোগের পরিণতিতে গ্রামে প্রত্যাবর্তন ও পরবর্তী দুই বছরব্যাপী অবমাননাকর জীবনযাপনের নেতিবাচক অভিঘাতই এ গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবসত্য। বিন্দির বয়ানে গল্পটির ঘটনাপ্রবাহের বিস্তার ও প্রতিবেশী মাখনদিকে সেই আখ্যান উপস্থাপনের প্রক্রিয়াটি গতানুগতিক ভঙ্গিকে অতিক্রমপূর্বক স্মৃতিচারণের আঙ্গিকে কথক-শ্রোতানির্ভর পরিবেশনার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। দ্বিপাক্ষিক আবেদন সঞ্চারের ফলে গল্পের ঘটনাসমূহ পরিবেশনে গল্পকারের বর্ণনা ও বিন্দির বয়ান মিলেমিশে পুরো বাগদি সমাজের চালচিত্রকেই জীবন্ত করে তোলে। এক্ষেত্রে চরিত্রসমূহের ব্যবহৃত ভাষারীতির (বিশেষত বাগদি ভাষায় প্রযুক্ত কথোপকথনরীতি, বাগধারা, প্রবাদ, ছড়া, আঞ্চলিক শব্দরাশি) ও অঙ্গভঙ্গিমা এবং বিন্দির মনোসংবেদনা প্রকাশোপযোগী স্বগোতোক্তি বা স্বগত কথনের (ড্রামাটিক মনোলগ) সঙ্গে ঘটনাপ্রবাহে উপস্থিত অন্য কুশীলবদের ক্রিয়াকর্ম, আচরণ, সংলাপ প্রভৃতির সমন্বয়ে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার রূপরেখা উপস্থাপিত হয়েছে।

১.২ গল্পটির নেপথ্যে ক্রিয়াশীল লোকসাংস্কৃতিক ও মানব-মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব অন্বেষণ

এ গল্পটির ভাবপরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লোককথা ও পুরাণের বিভিন্ন উপাদান আত্তীকরণের মাধ্যমে। লোকসংস্কৃতি মূলত সমষ্টিমানুষের জীবনযাপন ও জীবিকানির্বাহের, এমনকি তাদের সামগ্রিক জীবনপরিক্রমার আধার। আবার বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের পরিচর্যিত সংস্কৃতির মেলবন্ধনও অবিরাম ঘটে থাকে বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার সংশ্লেষে। ফলে একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বাসিন্দাদের জীবনধারায় বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতির সমাহার লক্ষণীয়। এ বক্তব্য বিশ্বের বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও

প্রযোজ্য। সেকারণেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোককাহিনির ভাবসাদৃশ্য ও চারিত্রিক বিন্যাসে বহুলাংশেই সমরূপতা প্রতিফলিত হয়।

১.৩ গল্পের ভাবার্থ ও ঘটনাকেন্দ্রিক পরিমণ্ডল

এ গল্পের বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে লোকসংস্কৃতি ও লোকমনস্তত্ত্বের প্রভাবজাত। বিশেষত লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বিভিন্ন লোককথা, পুরাণ প্রভৃতির প্রভাবে চরিত্রসমূহের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও গড়ন, ভাবমূর্তি ও কর্মকাণ্ডে সাদৃশ্য, ছায়াপাত কিছু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে নজরুলের সচেতনতা ও পরিমিতিবোধ অনস্বীকার্য। মানবস্বভাব-সন্নিহিত ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ – এরূপ যুগ্ম-বৈপরীত্যমূলক প্রবণতাসমূহের উপস্থিতি লোককথা, লোকপুরাণের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। সেখানে রাজপুত্র, রাজকন্যা, রাজা, রানী, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি চরিত্রে শুধু সদগুণের সমাহার ঘটে। তাদের ব্যবহার, আচরণ, সংলাপ মূলত একমাত্রিকতার ধারক হয়ে ওঠে। এর কারণ লোকসাহিত্য, পুরাণের আবেদন শ্রোতাসমাজের নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধন, তাদের চিন্তায় প্রভাব সৃষ্টি করা। ফলে বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভাবমূর্তিকে কখনো সরাসরি, কখনো রূপকার্থে প্রকাশের উদ্দেশ্য এসব লোককথা, লোকপুরাণে পরিলক্ষিত হয়। তেমনিভাবে বিভিন্ন খল, শঠ, দুষ্ট চরিত্রকেও সেখানে পাওয়া যায়, যাদের ভাবমূর্তি ও কর্মকাণ্ড সমাজে অশুভ, ক্ষতিকর, নেতিবাচক এবং বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। রাক্ষসী[৬], ডাইনি[৭], কুহকিনী[৮] প্রভৃতি চরিত্র এরূপ প্রবণতার অনুসারী। কিন্তু স্বভাবানুসারে মানুষ এরূপ একমাত্রিক প্রবণতার অনুসারী নয়। ফলে ভালো-মন্দ, হিত-অহিত, শুভ-অশুভ, উদারতা-কৃপণতা, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি বিপরীত প্রবণতা, গুণ-দোষের সমাহারে গল্প-উপন্যাসের চরিত্রসমূহ বাস্তবের রক্ত-মাংসের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে এবং লোককথা ও লোকপুরাণের একমাত্রিক চরিত্রসমূহের বিধিবদ্ধ গণ্ডিকে অতিক্রম করে। এ বক্তব্য 'রাক্ষুসী' গল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

গল্পটির নামকরণ থেকেই ধারণা করা যায়, গল্পকার বাংলার লোককথায় উপস্থিত রাক্ষসী ও পুরাণে বর্ণিত তাড়কা রাক্ষসীর[৯] প্রভাবজাত এক নারীকে এতে বিনির্মাণ করেছেন। অর্থাৎ লোকসাহিত্যের ছাঁচে ঢালা কাঠামোর হুবহু অনুসরণ অথবা ছায়াপাতের পরিবর্তে আংশিক সাদৃশ্য ও বিস্তৃত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা – উভয়ের সমন্বয়ে বিন্দি চরিত্রটিকে গল্পকার গড়ে তুলেছেন। বিন্দি মধ্যবয়সী কায়িক শ্রমজীবী বাগদি নারী, যে পাঁচুর বাপের বিবাহিতা স্ত্রী ও তিন ছেলেমেয়ের মা। আটপৌরে একজন নারী হিসেবে নিজের পরিবার সামলাতে সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। সমর্থ ছেলেমেয়েকে বিয়ে দিতে আর্থিক উপার্জনে সে তৎপর থাকে। স্বামীর কাজকর্ম, আচার-আচরণের ব্যাপারে বিন্দি অত্যন্ত সচেতন। সে কেন ও কীভাবে খুনী হিসেবে আইনের কাঠগড়ায় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ও সমাজের কাছে খলনারীতে পরিণত হয়, 'রাক্ষুসী' নামে অভিহিত তার রূপান্তরই গল্পটির প্রতিপাদ্য। ব্যক্তির কৃতকর্মের পরিণতিতে রাষ্ট্র নির্ধারিত বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ হলেও সমাজের বাসিন্দাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর জের বহুকাল রয়ে যেতে পারে, যেমনটি ঘটেছে বিন্দির ক্ষেত্রে। কারাভোগের পর গ্রামে ফিরলে সেখানকার বাসিন্দারা তাকে পুনরায় দণ্ডিত করে। এটি হল অদৃশ্য বিচারালয়, যেখানে বিন্দিকে সামাজিকভাবে অপদস্থ হতে হয়। এরই অংশ হিসেবে তারা তাড়কা রাক্ষসীর অনুকরণে বিন্দিকে 'রাক্ষুসী' নামকরণের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করেছে। তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে অশুভ, ভয়ংকর ও নেতিবাচক ভাবমূর্তিতে, যেহেতু সে স্বামীহন্তারক। বিন্দির প্রতি গ্রামবাসীর নিত্যদিনের সংঘাতময়, প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ ও মানসিক পীড়ন তাকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ করে। তাদের সঙ্গে বহুকাল ওঠা-বসা, মেলামেশার পরিণতিতে এমন নেতিবাচকতা সে মেনে নিতে পারেনি। ফলে তার আচরণ, ব্যবহার ও মনোভাবনায় বৈকল্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার ভাবমূর্তি ক্রমশ 'খুনী' ও 'রাক্ষুসী'র মতো নেতিবাচকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দ্বারা চিহ্নিত হয়, যা থেকে তার মুক্তিলাভ অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ সমাজ নারীর সদর্থকতাকে অস্বীকারে ব্যতিব্যস্ত, তার সদগুণ ও কল্যাণকামী সত্তাকে ধ্বংস করতে তৎপর এবং পুরুষের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সদাসচেষ্ট। ফলে স্বামীকে খুন করার পরিণতিতে বিন্দির প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণই অপরতাবোধে আচ্ছন্ন হয়, যার পরিণামে সে নিজের মৃত্যু কামনা করে। তার কর্মোদ্যোগ, স্বামী-সন্তানকেন্দ্রিক সংসারচিন্তা, পারিবারিক জীবনে শান্তির প্রত্যাশায় কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা – প্রভৃতি যে সমাজের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, এর বিশেষ কারণ হলো– সে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ, অন্যের কথায় প্ররোচিত হতে নারাজ। এমনকি যা করা উচিত, তা করতে সে দ্বিধাহীন।

তার আপসহীন মনোভঙ্গি, অনমনীয়তা, প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা অকুতোভয় নারীর ভাবমূর্তিকে অবক্ষয়িত, রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভয় পায়। বিন্দিকে বশে আনতে না পেরে সদা উদ্বিগ্ন থাকে। তাই তাকে আয়ত্ত করতে সমাজের বহুজনের পায়তারা গল্পটিতে বিভিন্ন ঘটনার আলোকে উন্মোচিত হয়। সমাজ কর্তৃক বিন্দির 'রাক্ষুসী' নামকরণ প্রকৃতপক্ষে তার দ্রোহ ও অকুতোভয় মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। নারীশক্তির প্রতি নজরুলের আস্থা ও পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে জীবনযাপনের অনবদ্য শিল্পরূপ 'রাক্ষুসী' গল্প।

১.৪ গল্পপাঠের আলোকে ব্যক্তি-সমষ্টির মধ্যে বিদ্যমান অপরতাবোধের স্বরূপ উদ্ঘাটন

গল্পটির ঘটনাপ্রবাহ উন্মোচিত হয়েছে শিউড়ির কারাগারে দুই বছর কারাভোগের পর নিজ গ্রামের বাড়িতে বিন্দির প্রত্যাবর্তনের ঘটনায়। সংস্কারবশত স্বামীর নাম মুখে না আনলেও তিন সন্তানের জনক পাঁচুর বাপকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার কারণে বিন্দির সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তার শাস্তি আরও কমতে পারত। কিন্তু থানার দারোগা তদন্তকাজের বাহানায় তার সঙ্গে অসদাচরণ করে এবং বিন্দির প্রতিবাদের কারণে বিচারককে দিয়ে দণ্ডের মেয়াদ বাড়ায়। এ ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, তার প্রতি সুযোগসন্ধানী দারোগার মনোভাব ছিল অনৈতিক ও অসৎভাবাপন্ন। তার অভিলাষ ব্যর্থ হওয়ায় সে বিন্দির ব্যাপারে বিরূপ ছিল। নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি যে নেতিবাচক, এ ঘটনাতেও বিষয়টি উন্মোচিত হয়। জনৈক বিদেশি শাসক দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের উদারতাবশত বিন্দি অন্য আসামীদের সঙ্গে দুই বছরের ব্যবধানে কারামুক্তি পায়। কিন্তু নিজ বাড়িতে আসার পর গ্রামবাসীর বিভিন্ন ধরনের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে বিন্দির মনে হতে থাকে, তার কারাবাসই বরং ভালো ছিল। কারণ বিন্দিকে ও তার ছেলেমেয়ে, পুত্রবধূকে নিয়ে কুৎসা ও গুজব রটনা, গালিগালাজ করা, একঘরে করা, খারাপ নামে ডাকা প্রভৃতি ঘটনার সমন্বিত অভিঘাতে প্রতিক্রিয়ায় তার অবচেতনলোকে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে আক্রোশ, বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে। তাই সেও তাদেরকে দেখলে অশ্লীল সম্বোধন ও গালিগালাজ করে, কখনো বা মারমুখী হয়ে ওঠে। স্বামীকে খুনের দায়ে তার কারাবাসের ঘটনাকে গ্রামবাসী সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। বিন্দির স্বামীর সঙ্গে রথো বাগদীর 'কড়ুই রাঁড়ি' মেয়েটির পরকীয়া প্রণয় ও 'স্যাঙ্গা করা'র ব্যাপারে তার কঠোরতাকে মেনে নিতে তারা অসম্মত। কারণ বাগদি সমাজে এরূপ নৃশংস ঘটনা ইতঃপূর্বে ঘটেনি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে বরাবর পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করে চলতে হয়। যেহেতু স্বামীই পরিবারের অভিভাবক, তাই তার কথা, ইচ্ছা, নির্দেশের বিরুদ্ধে স্ত্রীর অবস্থান গ্রহণ বা অস্বীকার করা সামাজিক অনুশাসনের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হয়। বিন্দির আক্রোশের বিশেষ কারণ হল, প্রতিবেশী অন্য নারীরা কখনো পুরুষের অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না। বরং পরিবারের অভিভাবক ও আশ্রয়দাতা হিসেবে বাবা, ভাই বা ছেলের অধীনে থেকে সংসারযাপন করে। স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণের ও সাংসারিক ব্যয় মেটানোর দায়িত্ব স্বামীর ওপর। তাই তার অভিমত ও আজ্ঞা তাদেরকে নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয়। এরূপ প্রথা বহুযুগ ধরে চলমান, যার বিরোধিতা করায় বিন্দিকে সমাজের লোকজনের নিকট অপদস্থ হতে হয়। গল্পের শুরুতেই প্রতিবেশী মাখনদিকে উদ্দেশ্য করে বিন্দির নিগৃহীত জীবনের বয়ান থেকে প্রতিফলিত হয় গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে তার হার না মানা লড়াইজাত অন্তর্দহন:

বিন্দির প্রতি গ্রামবাসীর অপরতাবোধ তীব্র হয়ে ওঠার কারণ হল, সে পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসন, প্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দুঃসাহস শুধু মুখের কদর্য গালাগালেই প্রকাশ করেনি, বরং তথাকথিত পুরুষতন্ত্রের ধ্বজাধারী স্বামীর বিরুদ্ধেও সক্রিয় আচরণ করেছে, এমনকি তাকে হত্যা করতেও সে অকুতোভয় ছিল। এ সমাজের কঠোরতা, অমানবিকতার শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ বিন্দি পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে গিয়ে স্বামীর পরকীয়াজনিত কেলেংকারির পরিণামে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল। তখন সমাজ তার পাশে থাকেনি, প্রকৃত ঘটনা জেনেও এর প্রতিকার করেনি। কারণ এমন ঘটনা বহু বছর যাবত সমাজে প্রচলিত, এমনকি অলিখিতভাবে অনুমোদিত। স্বামীর বেলায় যে অপকর্ম সমাজের দশজনের নিকট দিব্যি বৈধতা পায়, স্ত্রী হিসেবে বিন্দির ক্ষেত্রে তা ভয়ানক অপরাধ হিসেবে গণ্য হওয়ার অন্তরালে যে পুরুষতান্ত্রিক কূটকৌশল ও যথেচ্ছাচার সক্রিয়, তা বিন্দি উপলব্ধি করেছির। ফলে স্বামীহত্যার মাধ্যমে বিন্দি পাঁচুর বাপকেই শুধু শাস্তি দেয়নি, বরং রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্রকেও অস্বীকার করেছে। এর ধারাবাহিকতায়

কারাভোগের পরিণতিতে সে গ্রামে ফিরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কদর্য, অবমাননাকর পরিচয় পেয়েছিল। ফলে তার মানসপটে অবারিতভাবে উন্মোচিত হয়েছিল বহুযুগ ধরে প্রচলিত এ অবক্ষয়িত, ভঙ্গুর সমাজের স্বরূপ। সমষ্টির তথা গ্রামবাসীর একজন হিসেবে তার অভ্যস্ত জীবন অবশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সামাজিক পরিমণ্ডল থেকে, তাদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও জোরপূর্বক তাকে এড়িয়ে যাওয়ার পুনরাবৃত্তিতে। বিন্দির প্রতি গ্রামবাসীর অপরতাবোধ যে তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তা এ সংলাপে প্রতিধ্বনিত– "গাঁয়ের এই বেদিল মানুষগুলো ... রাত্তির-দিন নানান কথা বলে জানটাকে খেপিয়ে তুলেছে। ... তা যারই কাছে ঘেঁষতে চাই, সেই মনে করে এই আমায় খেলেরে! আমি যেন ডাইনি কুহকিরও অধম!' (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৬) প্রকৃতপক্ষে এ সমাজটিই তার কাছে ক্রমশ কারাগার হয়ে ওঠে, যেখানে সে মুক্তির আনন্দ অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনযাপনের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ফেলে। তার অভ্যস্ত জীবনের প্রবহমানতায় বিচ্যুতি ঘটে প্রতিবেশী, পরিচিতজনের বিরূপতায় এবং আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে। বাগদি সমাজের একজন হয়েও তার প্রতি অন্যদের দূরত্ববোধ দিনদিন বাড়তে থাকে। বিন্দি এর কারণ বুঝে উঠতে না পারলেও সমাজের প্রতি সে অভিযোগ উত্থাপন করে। তার মতে, সে প্রতিবেশীদের কোনো অনিষ্ট সাধন করেনি। তাই তার প্রতি লোকজনের কদর্য আক্রমণ ও অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণ বুঝে উঠতে সে অসমর্থ:

বিন্দির মতে, সে যে তার স্বামীকে হত্যা করেছে, সে ব্যাপারে গ্রামবাসীর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না। কারণ এটি একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বামী ও পিতা হিসেবে সে বিন্দি ও ছেলেমেয়েদের অসম্মানিত করেছে। এমনকি অভিভাবক ও সংসারের কর্তা হিসেবে সমাজেরই আরোপিত দায়িত্ব পালন থেকে সরে গিয়ে ধর্ম-অনুশাসনবিরোধী আচরণ করেছে অন্য নারীর সঙ্গে পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে। তাই স্ত্রী হিসেবে বিন্দি এর প্রতিকারে নির্দ্বিধ ছিল। স্বামীকে খুনের পরিণাম কী হবে, তা সে জানত। অন্য নারীর সঙ্গে নিজ স্বামীর আসক্তি ও নতুনভাবে তাদের সংসারী হওয়ার ব্যাপারটি বিন্দির অহমবোধে চরম আঘাত করায় সে তা মানতে পারেনি। তবে নিজের কৃতকর্মের জন্য বিন্দি গ্রামবাসীর কাছে অনুতাপ প্রকাশে অসম্মত। বিন্দির প্রতি উৎপীড়ন বজায় রাখলে সে যে তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর হবে, এরূপ হুমকি মাখনদিকে জানানোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় তার অন্তর্গত বিক্ষোভ ও অসহিষ্ণু মানসিকতার স্বরূপ:

এটিই হচ্ছে অপরতাবোধের চরমতম রূপ, যখন অন্যের আচরণ, ব্যবহার প্রভৃতি ব্যক্তিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, এমনকি তার ওপর আরোপিত ধারণা, ভাবনাকে সে সচেতনভাবে অস্বীকার করা সত্ত্বেও অবচেতনে গ্রহণ করতে বা মেনে নিতে বাধ্য হয়। কারামুক্তির পর গ্রামে এসে বসবাসকালে প্রতিবেশীরা তাকে অভিযুক্ত করেছে স্বামীহন্তারূপে, সমাজে প্রচলিত খারাপ নারীর দৃষ্টান্ত হিসেবে লোককথা ও পুরাণের খলচরিত্র 'রাক্ষুসী'র সঙ্গে তাকে একই কাতারভুক্ত করেছে।[১০] গ্রামবাসী বিন্দিকে নিজেদের দলভুক্ত হিসেবে বিবেচনায় অসম্মত এবং তাকে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করার সুযোগ দিতেও অনাগ্রহী বিধায় বিবিধ প্রতিবন্ধকতা তৈরিতে তৎপর ছিল। তাকে গ্রামের ছেলেমেয়েরাও ভয় পায়। কারণ পরিবারের ও সমাজের অন্যদের নিকট থেকে তারা জেনেছে, বিন্দি হলো রাক্ষুসী, যে মানুষকে খুন করে। কারাবাসের পর থেকে গ্রামে বিন্দিকে দেখলেই গ্রামবাসীর পলায়ন বা তাকে এড়িয়ে যাওয়া, প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের তাকে দেখে 'পাগলী', 'রাক্ষুসী' প্রভৃতি সম্ভাষণ নিঃসন্দেহে তার প্রতি গ্রামবাসীর ঘৃণা, দূরত্ব ও অনন্বয়ের প্রতিফলনবিশেষ। লোককথা ও পুরাণের অদেখা রাক্ষসীকে তারা বিন্দির মাধ্যমে অবলোকন করে– 'ছেলেমেয়েরা তো নাকমুখ সিঁটকে ভয়ে একেবারে আঁৎকে ওঠে! হাজার গজ দূর থেকে বলে, 'ওরে বাপরে, ঐ এল পাগলি রাক্ষুসী মাগি, পালা–পালা! খেলে, খেলে!' (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৪) 'নীলকমল ও লালকমল' লোককথায় রাক্ষুসী যেভাবে উপস্থিত, এর ভাবসাদৃশ্যগত প্রভাব বিন্দি চরিত্র রূপায়ণে লক্ষণীয়:

> এক রাজার দুই রানী; তাহার এক রানী যে রাক্ষসী! ... রাক্ষসী রানীর মনে কাল, রাক্ষসী-রানীর জিভে লাল। রাক্ষসী কি তাহা দেখিতে পারে?–কবে সতিনের ছেলের কচি কচি হাড়–মাংসের ঝোল অম্বল রাঁধিয়া খাইবে;–তা পেটের দুষ্টু ছেলে সতিন-পুতের সাথ ছাড়ে না। রাগে রাক্ষসীর দাঁতে–দাঁতে কড়ুকড়ু পাঁচ পরান সর্‌সর্‌। ... জো না পাইয়া রাক্ষসী ছুতানাতা খোঁজে, চোখের দৃষ্টি দিয়া সতিনের রক্ত শোষে। ... দুই দিনের দিন লক্ষ্মীরানীর কাল হইল। রাজ্য শোকে ভাসিল। ...

> রাক্ষসী সতিন-পুতকে তিন ছত্রিশ গালি দেয়, আপন পুতকে ঠোনা মারিয়া খেদায়। ... এক রাত্রে রাজার হাতিশালে হাতি মরিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া মরিল, গোহালে গরু মরিল;–রাজা ফাঁপরে পড়িলেন। ... রানী ছুটিয়া আসিয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া রাজার গায়ে মারিল,– হাত নড়ে না, পা নড়ে না, রাজা বোকা হইয়া গেলেন। (বিশ্বজিৎ, ২০১৩ : ৭৭-৭৯)

১.৫ কল্যাণময়ী গৃহিণী বনাম 'রাক্ষুসী' : বিন্দির মানবীসত্তার অবনমনের কার্য-কারণ সনাক্তকরণ

বিন্দি তার অতীত বৃত্তান্ত ভুলে নতুন করে সংসারের হাল ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসী তাকে দিনেরাতে ঘরে বাইরে কাজেকর্মে 'রাক্ষুসী' নামে অভিহিত করে এবং তাকে ক্রমশ ক্ষেপিয়ে তোলে। তার মতে, তাদের এরূপ আচরণ অসঙ্গত, যার পরিণাম কারো জন্য মঙ্গলজনক হতে পারে না। মাখনদির নিকট বিন্দির জবানিতে প্রকাশিত হয়েছে পতিব্রতা স্ত্রী ও তিন সন্তানের মা হিসেবে তার গৃহিণী জীবনের চালচিত্র। সহজ-সরল স্বভাবের স্বামী পাঁচুর বাপকে নিয়ে তার সংসার ভালোভাবেই চলছিল। বিন্দির স্বামীকে দিয়ে কেউ কাজ করিয়ে নিত বিনা পারিশ্রমিকে, কেউ তার পাওনা পরিশোধে প্রতারণার আশ্রয় নিত, তবু এসব নিয়ে তার আক্ষেপ ছিল না। সে ছিল চাষী, কৃষিকাজের মাধ্যমে সম্বৎসরের খোরাকি উপার্জন করত। বিন্দিও সাংসারিক ভার সামলে বাড়তি উপার্জনের জন্য মাছ ধরে, চাল কেঁড়ে, ধান ভেনে আনত। তার বড় ছেলেটি বিয়ের যোগ্য হওয়ায় লোকের 'উপর-নজর' বা কুদৃষ্টির শঙ্কায় সে তাকে বিয়ে দিতে মরীয়া ছিল। তার পিঠাপিঠি বোনও দিনদিন বেড়ে উঠছিল। আবার কোলের ছোট বোনটিও কথা বলতে শিখছিল। তাই তাদেরকে নিয়ে বিন্দির ব্যস্ততা বিভিন্ন সাংসারিক কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল। তার পরিবার আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ না হলেও স্বচ্ছল ছিল। কারো কাছে ধার করার দৈন্য তার ছিল না। প্রতিদিন তিন সের চাল, তরকারি প্রভৃতি পরিবারের জন্য লাগত, যা উপার্জনের জন্য সে মাছ, শামুক, গুগলি প্রভৃতি সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত থাকত। বড় ছেলেটিকেও সে কাজে যুক্ত করেছিল বাড়তি উপার্জনের জন্য। বড় মেয়েটিও পাড়ার বৌ-ঝিদের সঙ্গে শাক-মাছ সংগ্রহ করে আনত, যা দিয়ে তাদের সংসার ভালোভাবেই চলত। সবার প্রচেষ্টায় তাদের সংসার ছিল শান্তিময়। খরচ কমাতে স্বামী-সন্তানদের ভাত খেতে দিয়ে বিন্দি ফেনটুকু খেত। তবে উৎসবে, পালা-পার্বণে সে অতিথি ও ফকিরদের খাওয়াত। গিন্নীপনায় সে ছিল পটু, বাড়তি খরচের গরজ তার ছিল না। প্রয়োজনে কারো কাছে ধার চাইলে পাবে না, কেউ এগিয়ে আসবে না জেনেই সে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করত। তার মিত্যব্যয়িতাও লোকের নিকট যক্ষের ধন পাওয়ার মতো রটনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাকে কেউ কেউ 'কিরপিন' বললেও সে তা কানে তুলত না। কারণ সে জানত, কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে নিতে সে গ্রামবাসীকে পাশে পাবে না। বিন্দির সাধ-আহ্লাদ বলতে কিছুই ছিল না। পরিবার নিয়ে নির্বিঘ্নে দিনযাপন, গিন্নিপনাই ছিল তার একমাত্র অভিলাষ, যা অন্যদের নিকট পরশ্রীকাতরতার বিষয় হয়ে উঠেছিল:

> তবে বুঝতুম, অনেক কড়ুই রাঁড়ির বুক চচ্চড় করত হিংসেয়, আমাদের এই এতটুকু সুখ দেখে। ... আমি মনে করতুম, আর যটা দিন বাঁচি এমনি করে সোয়ামির সেবা করে, ছেলে-মেয়ে চড়িয়ে নাতিপুতি দেখে আমার হাতের নোওয়া অক্ষয় রেখে মরি; কিন্তু তা আমার পোড়া বিধাতার সইল না। আমার সাধের ঘরকন্না শ্মশানপুরী হয়ে গেল।' (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৬)

বিন্দির স্বামীর মদপানের অভ্যাস ছিল। সুযোগ পেলেই শুঁড়িখানায় নেশাগ্রস্ত হয়ে সে উপার্জিত অর্থ খরচ করত। বিন্দি এ ব্যাপারে তাকে কঠোরভাবে শাসন না করায় দিনদিন সে বিপথে যেতে থাকে। বিন্দির আক্ষেপ ছিল– 'তার মত অমন সোজা লোক পেয়ে কে কি খাইয়ে দিয়ে তাকে যে অমন করে দিয়েছিল, তা আমি নিজেই বুঝতে পারি নাই।' (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৬) রথো বাগদির দু-তিনটা 'সাঙ্গা করা' 'কড়ুই রাঁড়ি' মেয়েটি, যে কখনো স্বামীর সংসার করেনি, সে পাড়ার উঠতিবয়সী ছেলেদের প্রলুব্ধ করত। সে পাঁচুর বাপকে ছলনার জালে আটকেছিল তার সঞ্চিত অর্থ আত্মসাতের লোভে। এ ব্যাপারটি জানতে পেরে বিন্দি তার স্বামীকে সেই রাতে ঝাঁটাপেটা করেছিল। কারণ এ ঘটনায় তার ব্যক্তিত্বে আঘাত লেগেছিল। খারাপ স্বভাবের মেয়েটির প্রতি বিন্দির স্বামী আসক্ত, বিষয়টি মানতে না পেরে সে এর প্রতিবাদ করায় পাঁচুর বাপের ভয়ানক প্রহারের চোটে চেলাকাঠের আঘাতে তাকে রক্তাক্ত হতে হয়। কিন্তু এ ঘটনায় শারীরিক বেদনার চেয়ে সে মনে বেশি আঘাত

পেয়েছিল– 'আমি যে সেদিন স্পষ্ট বুঝলুম, আমার নিজের সোয়ামি আজ পর হলো। আমি দেখতে পেলুম, আমার কপাল পুড়েছে।' (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৭)

পাঁচুর বাপের আচরণ দিনদিন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছিল। ঘরে আসা বাদ দিয়ে সে মুনিবের ঘরেই খেত, এমনকি সেখানেই রাতে ঘুমাত। স্ত্রীর প্রতি তার বিরূপতার পাশাপাশি রথো বাগদির মেয়েটির প্রতি আসক্তি ক্রমশ বাড়ছিল। বিন্দি নিজেই শুধু নয়, তার ছেলে, এমনকি পাড়ার হিতৈষী প্রতিবেশীরাও সংসারে মনোনিবেশের জন্য তাকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু সে এতে কর্ণপাত করেনি। 'ছুঁড়ি যে ওকে জাদু করেছিল! একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল। তখন বুঝলুম এতদিনে মিনসের ভীমরতি ধরেছে। ওকে 'উনপঞ্চাশে' পেয়েছে; তা নইলে কি এমন চোখের মাথা খেয়ে বসে লোকে!' (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৭-২৭৮) নিজের আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বিন্দি একদিন স্বামীর পায়ে ধরে মিনতি করেছিল, সে যেন সংসারে মনোযোগী হয়, অন্যদিকে না যায়। পাঁচুর বাপ যে ভুল করছে, বিন্দি সে ব্যাপারে তাকে বুঝিয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি মন উঠে যাওয়ায় সে তার মুখে লাথি মেরে বেরিয়ে যায়। এবার বিন্দি বুঝতে পারে, তার স্বামী আর স্ত্রী-সন্তান-সংসারের তোয়াক্কা করে না। স্বামী হিসেবে তার মনে কারো প্রতি মায়া-মমতা, ভালোবাসার বন্ধন অটুট নেই। আরেকদিন বিন্দি জানতে পারে, পাঁচুর বাপ তার বাক্স ভেঙে জমানো টাকা নিয়ে রথো বাগদিকে দিয়েছে। দুদিন পর তার মেয়েকে 'স্যাঙ্গা করা'র জন্য পাঁচুর বাপ যে এরূপ আচরণ করবে, বিন্দি তা কখনো ভাবতেও পারেনি। কারণ স্বামীকে নিয়ে সে বরাবর সন্তুষ্ট ছিল। তাই সে এবার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়। স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার অসম্মতি সত্ত্বেও যে স্বামী ধর্ম, সামাজিক বিধান অগ্রাহ্য করে আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করতে প্রস্তুত, তার এ আচরণ যে পাপ, এমনটিই বিন্দির ধারণা। তাই সে জেনেবুঝেই তার স্বামীর এরূপ অন্যায় আচরণ অস্বীকারপূর্বক তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। বিন্দি জানে, তার এ সিদ্ধান্ত ধর্ম ও সমাজের কাছে, এমনকি আইনের দৃষ্টিতে অন্যায়, অগ্রহণযোগ্য। তবু সে স্বামীর অন্যায়ের জেরে নিজের সম্মানহানি ও পরিবারের দুর্দশা মেনে নিতে অসম্মত। এতে তার ভাগ্যলিপিতে যত শাস্তিই আরোপিত হোক, সে তা মেনে নিতে রাজি আছে– "ভগবান, ... আমি আমার দেবতাকে নরকে যাবার আগে তাঁর জানটা তোমার পায়ে জবা ফুলের মতো 'উচ্ছুগউ' করব, তুমি তাঁর সব পাপ খণ্ডণ করে আমাকে শুধু 'দুখখু' আর কষ্ট দাও।" (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৮) গল্পকার বিন্দিকে দিয়ে পাঁচুর বাপের হত্যার বৃত্তান্ত যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, এর সঙ্গে পুরাণের ভাবগত ও চরিত্রগত সাদৃশ্য রয়েছে। বিশেষত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পূজিত দেবী দুর্গা কর্তৃক মহিষাসুর বধের বৃত্তান্ত এ গল্পের বিন্দি ও তার স্বামীর দাম্পত্যসম্পর্কের পরিণতি নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নজরুল সম্ভবত এ পুরাণ অনুসরণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিন্দির জবানিতে স্বামীকে হত্যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

> সেদিন সাঁঝে একটু ঝিমঝিম বিষ্টির পর মেঘটা বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এমন সময় দেখতে পেলুম, আমার সোয়ামি একা ঐ আবাগিদের বাড়ির পেছনের তেঁতুল গাছটার তলায় বসে খুব মন দিয়ে একটা খাটের খুরোয় র‍্যাদা বুলোচ্ছে!– কি করতে হবে ঝাঁ করে ভেবে নিলুম! চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম কেউ কোথাও নাই। আমি পাগলির মতো ছুটে এসে দাটা বের করে নিলুম, সাঁঝের সূর্যটার লাল আলো দাটার উপর পড়ে চকচক করে উঠল। ... আমি আঁচলে দাটা লুকিয়ে দৌড়ে বাঘিনীর মতো গিয়ে, ওঃ সেকি জোরে তার বুকে চেপে বসলুম। সে হাজার জোর করেও আমায় উলটিয়ে ফেলতে পারলে না। তার ঘাড়ে মস্ত একটা কোপ বসিয়ে দিতেই আমার হাতটা অবশ হয়ে এল। তখন সে দৌড়ে পাশের পাটখেতটায় গিয়ে চিৎকার করে পড়ল। আমি তখন রক্তমুখো হয়ে উঠেছি। আমি আবার গিয়ে দুটো কোপ বসাতেই তার ঘাড় হতেই মাথাটা আলাদা হয়ে গেল। তারপর খালি লাল আর লাল। আমার চারিদিকে শুধু রক্ত নেচে বেড়াতে লাগল। (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৯)

এর সঙ্গে পুরাণের দেবী দুর্গা কর্তৃক মহিষাসুর বধের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে মিলিয়ে নেয়া যেতে পারেঃ

> দেবী দুর্গা মহিষাসুর দৈত্যকে বিনাশ করেছিলেন বলে মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হন। মহিষাসুরের অত্যাচারে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে বিষ্ণু বললেন, ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষজাতীয় জীবের হস্তে অবধ্য। তবে দেবতাদের তেজ হতে যদি এক পরম রূপবতী নারী সৃষ্টি

> হয়, তবেই তিনি মহিষাসুর বধ করতে সমর্থ হবেন। দেবতাদের মিলিত প্রার্থনায় এক অপূর্ব লাবণ্যময়ী অষ্টাদশ-হস্তা নারী সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন দেবতার তেজ হতে তার বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি হলো। ... মহিষাসুর এই মহাশক্তিসম্পন্না নারীর সংবাদ পেয়ে তাঁকে তার সম্মুখে আনবার জন্যে দূত প্রেরণ করে অকৃতকার্য হলে সেনাপতিদের পাঠানো হলো। তারা দেবীর হস্তে নিহত হলে মহিষাসুর নিজেই দেবীর কাছে গেল। তখন দুই জনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিছুদিন যুদ্ধের পর দেবী চক্র দ্বারা মহিষাসুরের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিহত করলেন। সেই থেকে দুর্গা মহিষমর্দিনী নামে খ্যাতা। (সুধীরচন্দ্র, ২০০৮ : ৩৩৬)

কারাবাসকালে বিন্দি মানসিকভাবে বেশ অসুস্থ ছিল। তখন সে স্বামীকে খুনের দৃশ্যাবলি চোখের সামনে দেখতে পেত। তাই ভয়ের চোটে সে অন্ধকারে একা থাকতে পারত না। তবে ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়, স্বামীকে খুনের ব্যাপারে তার মনোলোকে কোনো অপরাধবোধ ছিল না। কারণ বহুকাল যাবত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপারটি বরাবর উল্টোভাবেই প্রচলিত থেকেছে, পুরুষের হাতেই নারীকে বারবার খুন হতে হয়েছে। এরূপ অবমাননাকর পরিস্থিতিতে বিন্দি এর প্রতিবাদ করেছিল। সে মাখনদিকে স্পষ্টভাবেই জানায়:

> পুরুষেরা ও-রকম চেঁচাবেই,−কারণ তারা দেখে আসছে যে, সেই মান্ধাতার আমল থেকে শুধু মেয়েরাই কাটা পড়েছে তাদের দোষের জন্যে। মেয়েরা পেথম পেথম এই পুরুষদের মতোই চেঁচিয়ে উঠেছিল কি না এই অবিচারে, তা আমি জানি না। তবে ক্রমে তাদের ধাতে যে এ খুবই সয়ে গিয়েছে এ নিশ্চয়। আমি যদি ঐরকম একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতুম আর যদি আমার সোয়ামি ঐ জন্যে আমাকে কেটে ফেলত, তাহলে পুরুষেরা একটি কথাও বলত না। তাদের সঙ্গে মেয়েরাও বলত, হাঁ, ওরকম খারাপ মেয়েমানুষের ঐ রকমেই মরা উচিত। কারণ তারাও বরাবর দেখে আসছে, পুরুষদের সাত খুন মাফ! (রফিকুল, ২০০৭ : ২৭৯-২৮০)

সেকারণেই স্বামীর খুনী বিন্দিকে সমাজ মেনে নিতে আপত্তি জানিয়ে তার ওপর বিবিধ নির্যাতন, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন দিনদিন বাড়াতে থাকে। নারীকে পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে পুরুষতন্ত্র কখনোই স্বীকার করে না − এ ব্যাপারটি অনুধাবনে সমর্থ হওয়ায় বিন্দিও সমাজের অনুশাসন, রক্ষণশীলতা, গোঁড়ামিকে পাত্তা দেয়নি। গ্রামে এসে বিবাহিত ছেলে-পুত্রবধূর সংসারে সে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করে। স্বামী হত্যাজনিত অপরাধবোধ থেকে সে নিজেকে দায়মুক্ত ভাবে। তবে সমাজ তার নির্লিপ্ত আচরণ ও স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তিকে কখনোই মেনে নেয়নি। তাই এর প্রতিকার হিসেবে বিন্দির ছেলেকে সমাজবিচ্ছিন্ন বা একঘরে করা হয়, তার মেয়ের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় না। জনৈক গ্রামবাসীর অভিমত− 'রাক্ষুসীর মেয়ে রাক্ষুসী হবে, এ ডাহা সত্যি কথা!' (রফিকুল, ২০০৭ : ২৮০) লোকজনের অহর্নিশ পীড়ন, গালাগাল, কুৎসা এবং অপতরপরতায় অতিষ্ঠ বিন্দি মানসিকভাবে পুনরায় পর্যুদস্ত হয়ে যায়। এমনকি এসব নিগ্রহের প্রতিক্রিয়ায় সে নিজেকে 'শতেকখুয়ারি ডাইনি রাক্ষুসী' ভাবতে থাকে।

এভাবেই পুরুষতন্ত্রের দুর্বিষহ শোষণ, লাঞ্ছনায় বিন্দির মতো সংবেদনশীল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী হীনম্মন্যতার পরিণতিতে মনোবৈকল্যের শিকার হয়− 'কড়ুইরাঁড়ি আঁটকুঁড়িরা যারা আমার সাত পুরুষের গিয়াতকুটুম নয়, তারা কিনা রাত্তিরদিন খেয়ে না খেয়ে লেগে গেল আমার পেছনে। ... পথের কুকুরকেও এত ঘেন্না হেনস্থা করে না।' (রফিকুল, ২০০৭ : ২৮০-২৮১) আত্মসম্মান, নারীত্বের অহম ও মানবিক গুণাবলি রক্ষায় তার এতকালের প্রয়াস অবশেষে ব্যর্থ হয়। তাই ক্ষোভে, অপমানের গ্লানিতে দগ্ধ বিন্দি মাখনদিকে অনুনয় করে তার হাতের মালসার আঘাতে নিজের মাথাটি চূর্ণ করার জন্য। এর মাধ্যমে তার বিপন্ন মানসিকতা ও আত্মধিক্কার প্রকাশিত হয়। স্বামীকে হত্যাজনিত পাপের দায় মেনে নিয়ে সে স্রষ্টার নিকট পার্থিব জীবন থেকে মুক্তি কামনা করে। বিন্দির প্রতি লোকসমাজের অবমাননা যে প্রকৃতপক্ষে তাদের সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুক আচরণের বহিঃপ্রকাশ, তা গল্পকার জানিয়েছেন তার সংলাপের মাধ্যমে, যেখানে স্বয়ং স্রষ্টা বা ভগবানের নিকট তার মর্মন্তুদ আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে। বাগদি সমাজের প্রতি বিন্দির আস্থা, নির্ভরতা ইতোমধ্যে ভূলুণ্ঠিত। এ গল্পে নজরুল বাঙালি সমাজে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ, অনুশাসন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং নারী-পুরুষের আন্তঃসমাজের বিপ্রতীপ চালচিত্র বিনির্মাণ করেছেন বাগদি গৃহবধূ বিন্দির জবানিতে। সে একাই লড়াই অব্যাহত রাখে সমগ্র সমাজ ও এর

বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে, যেখানে তার পাপবোধ, অপরাধ, দণ্ডবিধান ও শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রটি বিবেক তথা ব্যক্তিক নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত।

১.৬ গল্পটির সাহিত্য পর্যালোচনাভিত্তিক মৌল সূত্রসমূহ নির্দেশ

ক. গল্পকার সচেতনভাবেই বাঙালি পরিবারব্যবস্থা ও সমাজকাঠামোর সঙ্গে বাগদি পরিবারব্যবস্থা ও সমাজকাঠামোর প্রতিতুলনার অবকাশ অটুট রেখে গল্পটি রচনা করেছেন।

খ. বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাগদি সমাজ ও সংস্কৃতির সাদৃশ্য বহুলাংশেই লক্ষণীয়। কিন্তু মানসিকতা ও আচরণগত বিবেচনায় বাঙালি গৃহবধূর সঙ্গে বাগদি গৃহবধূর স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনের প্রয়াস হিসেবে বিন্দি চরিত্রটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

গ. গল্পটির সারবস্তু যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটি হল বাংলার লোককথা ও পুরাণকেন্দ্রিক ভাবপরিমণ্ডল।

ঘ. লোককথা ও পুরাণকেন্দ্রিক রাক্ষুসী চরিত্রটির মোটিফ ও বিন্যাসরীতি, স্বভাব ও মানসিকতাকে গল্পকার সচেতনভাবে আয়ত্ত করেছেন বিন্দি চরিত্র রূপায়ণে। ফলে মানবীসত্তায় লোককথা ও পুরাণের খলনারীর নেতিবাচক ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গির সন্নিবেশ বিন্দিকে বিশিষ্ট মাত্রায় উন্নীত করেছে। দোষে-গুণে, ভালো-মন্দের সমাহারে বাস্তবের নারীর প্রতিনিধি হিসেবেই গল্পকার তাকে গড়ে তুলেছেন।

ঙ. বীরভূমের বাগদি সমাজের ভাষা ও সংলাপকে গল্পকার বাংলা ভাষা ও সংলাপের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে চরিত্রসমূহের আচরণ, অভিব্যক্তি ও মনোভাবনা প্রকাশে গল্পকারের গদ্যরীতি প্রান্তিক বাগদিসমাজে প্রচলিত গদ্যরীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংহতি বজায় রাখতে পেরেছে। এক্ষেত্রে গল্পকারের মৌলিকতা অনস্বীকার্য।

চ. গৃহবধূর রাক্ষসীতে রূপান্তরের অন্তরালে গল্পকার বাগদি সমাজে বিদ্যমান অপরতাবোধের যে বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন, এর প্রতিফলন বহুকাল যাবত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান। বৈষম্যপূর্ণ সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর কর্তৃত্বপরায়ণ ও নিয়ন্ত্রণমূলক। সেই বিবেচনায় বিন্দি চরিত্রটি নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম। কারণ গল্পভাগে তার উপস্থিতিই আত্ম বনাম অপর – এ যুগ্ম-বৈপরীত্যমূলক সমীকরণ গড়ে তুলেছে এবং সমগ্র আখ্যানভাগকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তার অনুপস্থিতিতে গল্পটির ভরকেন্দ্র বিচ্যুত হতে বাধ্য।

১.৭ উপসংহার

'রাক্ষুসী', 'পাগলি', 'ডাইনি', 'কুহকি' প্রভতি সম্বোধনে বিন্দির প্রতি গ্রামবাসীর বিরোধাত্মক মনোভাব ও প্রতিহিংসাপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতই অপরতাবোধতাড়িত। গৃহবধূ হিসেবে একদা যে নারী গ্রামবাসীর নিকট সমাদর পেয়ে তাদেরই একজন হয়ে উঠেছিল, সেই পরিণামে খুনী হিসেবে কীভাবে তাদের প্রতিপক্ষ গণ্য হলো, এ বিষয়টিকেই গল্পকার 'রাক্ষুসী' গল্পে তাৎপর্যবহভাবে তুলে ধরেছেন। সমষ্টির গতানুগতিক অংশ হিসেবে নয়, বিন্দি চেয়েছিল ব্যক্তি হিসেবে সমষ্টির মনোযোগ ও সমীহ আদায় করতে। সেই অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব ও অহমবোধকে সে ধারণ করেছে প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে, ভাবনায়, মানসিকতায়। কিন্তু বিন্দির অনমনীয়তা ও দ্রোহী মনোভাব, যা স্ফুরিত হয়েছিল পরনারীর প্রতি তার স্বামীর অনৈতিক আচরণের বহিঃপ্রকাশের প্রতিক্রিয়ায়, তা গোপন করার তাগিদ বা প্রয়োজন তার ছিল না। তাই বিন্দির প্রতিবাদ যখন স্বামীহত্যার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুরুষতন্ত্রের প্রতি তার প্রতিরোধী অবস্থানকে স্পষ্ট করে তুলেছে, তখনই তার বিরুদ্ধে উপর্যুক্ত নেতিবাচক অভিধাসমূহ গ্রামবাসী আরোপ করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় বিন্দি স্বীয় অবস্থান থেকে বিচ্যুত না হলেও এ অবমাননাকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির প্রয়াসে মৃত্যুকেই কামনা করেছে, যা পুরুষতন্ত্রের প্রতি তার প্রবল

ধিক্কারবিশেষ। এর মাধ্যমে সে তাদের সঙ্গে নিজের যুক্ততাকে সরাসরি অস্বীকার করেছে। বাগদি এ প্রান্তিক নারীর আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষণশীল, অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের অবক্ষয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে চরম আঘাতস্বরূপ। সমগ্র গল্পে বিন্দির একক প্রতিরোধ সমষ্টিজন তথা গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে উচ্চকিত ভাবব্যঞ্জনায় সমাসীন। গল্পকারের অসাধারণ দূরদর্শী পরিকল্পনা ও শিল্পকুশলতাগুণে বাগদি নারী বিন্দির প্রান্তিকতা বরং কেন্দ্রাভিমুখী গ্রামবাসীর অবস্থানকেই প্রতিহত করে। এখানেই নজরুলের নারীভাবনা আধুনিকতামনস্ক, প্রাগ্রসর এবং সমকালোত্তীর্ণ, শাশ্বত দ্যোতনায় দীপ্যমান।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. জ্যাক দেরিদার 'ডিকনস্ট্রাকশন' পদবন্ধের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিনির্মাণ' বহুল প্রচলিত। এর আভিধানিক অর্থ 'ভাঙা' হলেও সম্প্রসারিত অর্থে 'পুনর্নির্মাণের জন্য ভাঙা' অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য অভিমত [পারভেজ হোসেন ও ফয়েজ আলম (সম্পা.), *জ্যাক দেরিদা : পাঠ ও বিবেচনা*, সংবেদ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩০]। পুরনো, গতানুগতিকের বিরুদ্ধে নতুনভাবে নির্মাণের প্রচেষ্টা বিনির্মাণের লক্ষ্য। দেরিদা *অফ গ্রামোটোলজি* গ্রন্থে এর প্রস্তাবনা করলেও তাঁর কোনো লেখাতেই বিনির্মাণের কৌশল উপজীব্য হয়নি। তিনি ভাষার মধ্যে সন্নিহিত অধিবিদ্যাগত উপাদান ধ্বংস করার পাশাপাশি যে কোনো রচনায় (টেক্সট) অনুল্লেখিত বা অনুপস্থিত অর্থকে উদ্ধারের তাগিদে বিনির্মাণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

২. যুগ্ম-বৈপরীত্যসূচক (বাইনারি অপোজিশন) ধারণা কাঠামোবাদী ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোসুরের নিকট থেকে গ্রহণ করেন বিনির্মাণবাদ (ডিকনস্ট্রাকশন) তত্ত্বের প্রবক্তা উত্তর-কাঠামোবাদী তাত্ত্বিক জ্যাক দেরিদা। (সালাহউদ্দিন আইয়ুব, *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৬১) এতে একটি ধনাত্মক ও আরেকটি ঋণাত্মক শব্দের সম্মিলনে শব্দজোড় সৃষ্টি হয়। কাঠামোবাদী ভাষাতাত্ত্বিক রোমান ইয়াকবসনের অভিমত হলো, বিভিন্ন প্রকার উপাদানকে শৃঙ্খলিত, একত্রিত করে কোনো বিশেষ বক্তব্যকে উজ্জ্বলতর করার জন্য এ ধরনের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। (আনন্দ ঘোষ হাজরা, *সাহিত্যবিচারে অবয়ববাদ, উত্তরাধুনিকতা এবং উপনিবেশবাদ*, একুশশতক, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৬)

৩. বাংলা ব্যাকরণে সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত 'অপর' শব্দটি বহুমাত্রিক অর্থবিশিষ্ট এবং পৃথিবীর প্রচলিত ভাষাসমূহে এর অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল। এ শব্দটি সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোচনায় সবিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে অর্থের বহুমাত্রিক প্রয়োগগুণে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ 'অপর' শব্দের অর্থ হিসেবে অন্য, ভিন্ন, পৃথক, ইতর, অর্বাচীন, নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, অন্যজাতীয়, প্রতিকূল, বিরোধী, শত্রু, ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয় যে, শব্দটির অর্থসমূহে রয়েছে ব্যবধান বা দূরত্ব, অনন্বয়সূচক মনোভঙ্গি। প্রকৃতপক্ষে, 'অপর'-সম্পর্কিত ভাবনার আশ্রয় হলো ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত প্রেক্ষাপট। দুজন সমালোচকের অভিমত–

> ক. বাংলা ব্যাকরণে 'অপর' শব্দ সর্বনাম ও বিশেষণ স্বরূপ। উত্তর ঔপনিবেশিক সংজ্ঞার্থের ইংরেজি অভিধানে শব্দটির ঔপনিবেশিক বা কলোনিয়াল প্রেক্ষিত থেকে ... অপর শব্দের ব্যুৎপত্তিতে রয়েছে দূরত্ববোধকতা। ভিন্ন, অন্য, তারতম্য, দ্বিতীয়, পৃথক ইত্যাদি। দ্বিপাক্ষিক বৈপরীত্যবোধ থেকে যে অর্থময়তায় যুক্ত হয়েছে 'পর' যা অপর শব্দের বিপরীতার্থ। যেমন 'অপর' প্রযুক্ত হয়েছে বিজাতীয়, ভিন্নধর্মী, ব্রাত্য, পিছিয়ে পড়া, ইতর, নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, বিরোধী, প্রতিকূল ইত্যাদি অর্থে। যে ভিন্ন কিন্তু তার শর্তে গ্রহণীয় সে উত্তম অপর, আর যে গ্রহণযোগ্য নয় সে অধম অপর। ঔপনিবেশিকতার আয়োজনে ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুল, শাসিতকে নিকৃষ্ট ঠাউরে নিয়ে শাসনের ঔচিত্য দাঁড় করানো এবং বজায় রাখা। [সমীর রায়চৌধুরী, 'অপরঃ সংজ্ঞা নিরূপণ', সমীর রায়চৌধুরী (সম্পা.), *অপর : তত্ত্ব ও তথ্য*, হাওয়া ঊনপঞ্চাশ প্রকাশনী, কলকাতা, গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুল্লেখিত, পৃ. ৫-৬)

খ. 'পর'কে যদি 'আত্ম'র শাসনভুক্ত, শর্তসাপেক্ষ করে তোলা যায়, 'পর'কে যদি 'আত্ম'র মনোমত ছাঁচে সাজিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেই 'পরে'র স্বাতন্ত্র্য লোপ পেতে বাধ্য। ঐ আত্মীকৃত আদল বা

নির্মিতি তাকে পরিণত করে 'আত্ম'র এক প্রক্ষেপে, প্রতিবিম্বে। 'পর' তখন আর ঠিক পর থাকে না, পৃথক কোনো সত্তায়, নিজস্ব কোনো সংজ্ঞায় তাকে শনাক্ত করা যায় না, পর হয়ে ওঠে 'আত্ম'র উৎক্রম (ইন্‌ভারশান্‌), সবয়ব প্রত্যক্ষতা হারিয়ে মনগড়া, বিমূর্ত ধারণা কেবল। আত্মকেন্দ্রিক এই চিহ্নব্যবস্থায় 'পর' কখনই বিষয়ীর মর্যাদা পায় না, নিছক বিষয় থেকে যায়। ... 'আত্ম' যেহেতু 'পরে'র মুকুরেই নিজেকে দেখতে চায় তাই নিজের কাছেও তার পরিচয় মূলত নেতিবাচকই থেকে যায়–উৎক্রমের উৎক্রম ঘটিয়েই কেবল পৌঁছোনো যায় আত্ম-কেন্দ্রে, এমন এক কেন্দ্রে, আদতে যা ফাঁপা এবং ফাঁকা। (শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৮-৯)

৪. বাগদি সম্প্রদায় প্রসঙ্গে সহায়ক তথ্যাদি নিম্নরূপ–

বাগদি বা বর্গ-ক্ষত্রিয় হলো আর্য-দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত এক জাতি, যাদের প্রধান বাসস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। এরা চাষাবাদ ও মাছ ধরার কাজে যুক্ত থাকে। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলায় বাগদিরা বাস করে। বাগদি সম্প্রদায় পশ্চিমবর্গের তফসিলি জাতিগুলির মধ্যে পরিসংখ্যানের দিক থেকে অন্যতম। বাংলার ইতিহাস বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যে শুধু *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ বাগদি সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থে বাগদিদের উদ্ভব সম্পর্কে জানা যায়– ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভে এ সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ বাগতীতের জন্ম হয়। (https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%A6%E0%A6%BF)

৫. সমালোচকদের প্রাসঙ্গিক অভিমত–

ক. আমার মতে নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প হলো 'রাক্ষুসী'। স্বামী সংসার ও সন্তানকে নিয়ে তুষ্ট এক ঘরস্তি যখন রাঁড়ি এক রূপসীর কাছে স্বামীকে নিশ্চিতভাবে হারালো আর কুহকিনীর কথায় স্বামী তার উপর দুর্বিষহ অত্যাচার করা আরম্ভ কওে দিলো তখন প্রতিকারের অন্য কোনো পথ না দেখে সম্বিৎ হারিয়ে দায়ের কোপে সে স্বামীর মাথা কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলো। তার স্বীকারোক্তি বাগদিদের ভাষায় গল্পে লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বীকারোক্তির রূপ ও মাধ্যমে মেয়েটার চরিত্র অত্যন্ত পরিষ্কার ও উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। ... রাক্ষুসী চরিত্রটা নিঃসন্দেহে এক মহৎ সৃষ্টি। আঙ্গিকের দিক থেকেও 'রাক্ষুসী' গল্পটা নজরুলের আর-সব গল্পের তুলনায় অনেকটা উন্নত। ... শক্তির অভাব নজরুলের ছিলো না। নজরুল যদি তাঁর বিদ্রোহী সদাচঞ্চল মনকে শান্ত করার চেষ্টা করতেন, যদি তাঁর কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধকে যথাযথ বাচনের শৃঙ্খলায় আনতে পারতেন, যদি ছোটগল্পের গঠন ও আঙ্গিক সম্বন্ধে অধিকতর হুঁশিয়ার হতেন, তবে সহজেই তিনি এক শ্রেষ্ঠ গল্পকার হতে পারতেন। ... 'রাক্ষুসী'র মতো গল্প উপহার দেবার জন্য বাংলার সমস্ত গল্পলেখক নজরুলের কথা অনেকদিন মনে রাখবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। [আবু রুশদ, 'ছোটগল্প', *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫]

খ. অপেক্ষাকৃত আঙ্গিক-সমৃদ্ধ গল্প 'রাক্ষুসী' অবিশ্বাস্য একটি কাহিনী নিয়ে লেখা। ... আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত ও বেদনাতপ্ত এই উপজাতীয় রমণীর জীবনবেদ্য ভাষায় স্ফুট হয়েছে। লোকভাষা ব্যবহারে সংলাপ বেশ তীক্ষ্ম। নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক সমধিক সফলতা অর্জন করেছেন। ... ঘটনার অবিশ্বাস্য গতি এই গল্পের আঙ্গিকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পের মত কল্পনার অকারণ আধিক্য এবং শিথিলভাবনা এ গল্পে নেই। (রাজিয়া সুলতানা, *কথাশিল্পী নজরুল*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৮৬-৮৭)

গ. 'রাক্ষুসী' বীরভূমের 'বাগ্দীদের ভাষায় রচিত' নজরুল ইসলামের একটি আঙ্গিক সমৃদ্ধ গল্প। ... নারী-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, ঘটনার অপ্রতিহত গতিতে রাক্ষুসী নজরুল প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (সৈকত আসগর, *নজরুলের গদ্যরচনা: ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০৪)

ঘ. 'রাক্ষুসী' গল্পের বিন্যাসরীতি পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করে। অসঙ্গত সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে বিন্দি নামক এক নিপীড়িত নারীর জীবন-যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত এ গল্পে বিধৃত হয়েছে। নজরুলের অধিকাংশ গল্পের মৌল প্রতিপাদ্য প্রেম হলেও আলোচ্য গল্পে সমাজ চৈতন্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে। বিন্দির স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হলে বিন্দি যে দুর্বার মানবিক সঙ্কটে নিক্ষিপ্ত হয় তারই শিল্পকথা 'রাক্ষুসী'। [চঞ্চল কুমার বোস, 'নজরুলের ছোটগল্প: আঙ্গিক ও ভাষাবিন্যাস', মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.) *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৬৮৭)

ঙ. নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্পটি বোধ হয় 'রাক্ষুসী'। ... আত্মচরিত্রের মুখ দিয়ে তীব্র তোড়ের মতো কাহিনি ধারা বেরিয়ে এস এক সময় শেষ হয়ে গেছে। .. স্বতঃস্ফূর্ত, আন্তরিক, জোরালো ভঙ্গিতে গল্পটি বলা ... হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায়ই গল্পটির শিল্পরূপ উচ্চচূড়া ছুঁয়েছে। ... এই গল্পের ভাষাভঙ্গির জ্যান্ত স্বাভাবিকতা নজরুলের অন্যান্য গল্পে ততখানি লক্ষ করা যায় না। 'বীরভূমের বাগ্দীদের ভাষায়' 'রাক্ষুসী' ... গল্পটির পরিমিতি ও মাত্রাসচেতনতা তাঁর অন্যান্য গল্পে প্রায় নেই বললেই চলে। [কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, 'নজরুলের গল্প', *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*, কল্পতরু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ২৩৯-২৪০)

৬. রাক্ষসী সম্পর্কে পৌরাণিক তথ্যাদি নিম্নরূপ–

রাক্ষসদের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণে এইরূপ লেখা আছে– পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জল সৃষ্টি করেন। তারপর প্রাণীগণকে সৃষ্টি করে বললেন–তোমরা সযত্নে এই জল রক্ষা কর। একদল বললেন, 'রক্ষামঃ'–আমরা রক্ষা করব। ব্রহ্মার আদেশে তারা রাক্ষস হোল। আর একদল? বললে, যক্ষামঃ–আমরা পূজা করবো; তারা যক্ষ হোল। ... বিষ্ণুপুরাণ মতে কশ্যপ ও দক্ষের কন্যা খসা হতে রাক্ষসদের জন্ম। রামায়ণ ও মহাভারতের মতে আর্যদের আগমনের পূর্বে যে জাতি এদেশে বাস করত, তারা অনার্য এবং তাদের রাক্ষস বলা হত। আর্যরা যুদ্ধ করে এই অনার্য রাক্ষসদের পরাজিত করেছিলেন। সাধারণত, রাক্ষসদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীকে অনেকটা যক্ষদের মত বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণী অত্যন্ত শক্তিশালী, এরা দেবতাদের শত্রু; তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে দানব ইত্যাদিরা। এরা সাধারণত নিষিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করে, যজ্ঞ ইতাদি নষ্ট করে, শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়, সাধু ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার করে, মানুষদের ভক্ষণ করে এবং সমস্ত মানুষকে নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করে। এই শ্রেণীভুক্ত রাক্ষসদের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাবণ। ... মহাভারতে ভীম কর্তৃক বক, কির্মীর ও হিড়িম্ব রাক্ষসদের বিনাশ এবং হিড়িম্বাকে বিবাহ করা দেখতে পাওয়া যায়। ভীমের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। [সুধীরচন্দ্র সরকার (সং.), *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ৩৬৮]

৭. ডাইনি হচ্ছে গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী নারী, যে তার অতিপ্রাকৃত শক্তি ও ক্ষমতার গুণে লোকসমাজে ভীতির সঞ্চার ঘটালেও বৈষয়িক প্রয়োজন মিটিয়ে সমীহ আদায়ে সমর্থ। ডাকিনীবিদ্যা বা তন্ত্র-মন্ত্রতে পারদর্শী নারীকে ডাইনি হিসেবে অভিহিত করা হয়। জাদু-তন্ত্র-মন্ত্র, গুণ করা, বশীকরণ, তুকতাক, নিষিদ্ধ বিদ্যা চর্চার প্রভৃতির মাধ্যমে বিশেষ শক্তি অর্জন করা তাদের লক্ষ্য। তাদের হিংস্রতা, কুটিলতা, খলতা, ধূর্ততা সাধারণ মানুষের বোধে বরাবর রহস্যময় বিবেচিত হয়। তারা মন্ত্রবলে পটু, গোপন ক্রিয়াকর্ম ও উপাসনা, আচারের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে, এমনকি অরণ্য-প্রকৃতি থেকে রসদ সংগ্রহ করে ডাকিনীবিদ্যা চালিয়ে যায়। মানুষের বিবিধ হিত ও অনিষ্ট উভয়ই সাধন করার এবং ভূত-ভবিষ্যত গণনা করার, ভাগ্য বদলানোর সামর্থ্য তাদের রয়েছে – লোকসমাজে এসব ধারণা বহুকাল যাবত প্রচলিত। লোকসমাজ থেকে দূরবর্তী স্থানে,

নির্জনে অসামাজিক জীবনাচারে এরা অভ্যস্থ বলে মনে করা হয়। অসুস্থতার প্রতিকার, সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্তি, আকস্মিক কোনো সমস্যার প্রতিকার প্রভৃতি প্রয়োজনে পশ্চাৎপদ ও রক্ষণশীল জনসমাজে, বিশেষত গ্রামীণ ও আদিবাসী সমাজে এদের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। অন্যকে বিভিন্ন কৌশলে বশে আনতে পারা তাদের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচায়ক। সমালোচকদের অভিমত–

> ক. ডাইনি প্রথা একটি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। এর সাহায্যে উদ্দিষ্ট মানুষকে 'তুক' করা এমনকি মন্ত্রবলে হত্যা করা পর্যন্ত সম্ভব হয়ে থাকে। শব্দটি ডাকিনীজাত বলেই মনে হয়। রাজকুমার ডাইনিমন্ত্রে ফুলগাছ বা পাখিতে পরিণত হয়ে যেত। ... মন্ত্র হচ্ছে মানুষের প্রার্থনার এক সাংকেতিক ভাষা। জরাব্যাধি ঈশ্বরের অভিশাপ প্রভৃতির সঙ্গে ভূত-প্রেত ডাইনির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ভূত-প্রেত তাড়াবার বাক্যগুলিই পরে ছন্দায়িত হয়ে ডাইনি ইত্যাদির মন্ত্রেও পরিণত হয়েছে। [দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৫৬]

> খ. রূপকথার এক বিশিষ্ট চরিত্র হল ডাইনী। ... ডাইনী সম্পর্কে প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও সংস্কারগুলির উৎপত্তি সমাজে বহুকালের। ... সমাজ পরিত্যক্ত, পরিবার বিচ্ছিন্ন বা বিহীন এক শ্রেণীর নারীকেই বাস্তব সমাজে যে ডাইনী তুল্য ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করা হয়। ... লোকসমাজে তাকে বঞ্চিত, প্রত্যাখ্যাত, অবহেলিত এক দুর্দশাগ্রস্ত নারীরূপেই দেখা যায়–যারা নাকি সমাজের বিশেষত পরিবারের অমঙ্গল কামনা করে। তারা নানা অলৌকিক শক্তিতে বলীয়ান হয়। পরলোকগত অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে–তাদের সাহায্য গ্রহণ করে অনেকে শত্রু নিধন, বশীকরণ প্রভৃতি কাজে সফল হয়। [শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক, *বাংলার লোকসংস্কৃতিকোষ*, বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পা.), অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২১১-২১২)

৮. কুহকিনী বা মায়াবিনী নারীর আরেক প্রহেলিকাময় পরিচয়ের নির্দেশক। নারীর রূপ, গুণ, ব্যক্তিত্ব, বাচনভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি মিলেমিশে তাকে সাধারণ মানবী পরিচয়ের চেয়ে ভিন্নতর মাত্রায় উন্নীত করে। ফলে পুরুষের নিকট সে হয়ে ওঠে অধরা, রহস্যময়ী। তাকে ছলনাময়ী, কুহকিনী, মায়াবিনী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। লোককথায় এসব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা ছলে বলে কৌশলে সাধারণ মানুষকে বিমোহিত করে, তাদেরকে বশ করার বিশেষ শক্তি এদের রয়েছে, এরূপ ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত। এরা প্রয়োজনমাফিক যে কোনো আকার বা ছদ্মবেশ ধারণে পারদর্শী, এমনকি অদৃশ্য হতে পারে, লোকের মনের কথা বুঝতে পারে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে তাদেরকে আনতে সমর্থ – এসব ধারণাও বহুকাল যাবত লক্ষণীয়। এদেরকে অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এদের মায়া বা ফাঁদে আটকে অনেকে বিপথগামী হয়। *ঠাকুরমা'র ঝুলি*র 'ডালিমকুমার' লোককথার পাশাবতী, 'কিরণমালা' লোককথার 'মায়ার পাহাড়' এবং 'সোনার কাটি রুপার কাটি' লোককথার রাক্ষসী চরিত্র কুহকিনী বা মায়াবিনীর প্রতিনিধি।

৯. তাড়কা রাক্ষসী প্রসঙ্গে পৌরাণিক তথ্যাদি নিম্নরূপ–

> তাড়কা– রাক্ষসীবিশেষ। সুকেতু নামে এক যক্ষের কন্যা। সুকেতুর তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা বরদান করেন। তার ফলে, সুকেতু সহস্র হস্তীতুল্যা বলশালিনী এক কন্যা প্রাপ্ত হন। এই কন্যার নাম তাড়কা। জম্ভ-দৈত্যের পুত্র সুন্দ অসুরের সহিত তাড়কার বিবাহ হয়। এর ফলে তাড়কার বলশালী পুত্র মারীচের জন্ম হয়। কোন একটি অপরাধের জন্য অগস্ত্যমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে বৃন্দকে বিনাশ করেন। এই কারণে তাড়কা ও মারীচ উভয়েই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অগস্ত্যকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। তখন তাঁর শাপে তাড়কা বিকৃতাননা রাক্ষসী ও মারীচ ভীষণা রাক্ষসে পরিণত হয়। পরে সেখানকার মলদ ও করুষ নামধেয় দুইটি সমৃদ্ধ জনপদ তাড়কা বিনষ্ট করে। ... অগস্ত্যের আশ্রমস্থ তপস্বীরা এদের উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করেন। মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবন ক্রমে তাড়কা রাক্ষসীর বনে পরিণত হয়। শেষে এমন অবস্থা উপনীত হয় যে, এদের অত্যাচারে কেহই আর যজ্ঞাদি করতে সমর্থ হয় না। পরে বিশ্বামিত্র এদের দমন করার অভিলাষে অযোধ্যায় গিয়ে তাড়কা বধের জন্য রাজা দশরথকে অনুনয় করে তাঁর দুই পুত্র রাম-লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে সেই বনে

গিয়ে উপস্থিত হন। এখানে রামের হাতে তাড়কা নিহত এবং মারীচ রামের বাণে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। সীতাহরণকালে রাবণকে সাহায্য করে মারীচ মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। [সুধীরচন্দ্র সরকার (সং.), *পৌরাণিক অভিধান*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ১৫৬]

১০. বাংলা সাহিত্যে প্রত্ন-মুদ্রণ বা প্রত্ন-ধাঁচের উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হিসেবে নজরুলের পূর্বসূরী কালজয়ী কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী-অপরাজিত* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অপুর ব্যক্তিত্ব, জীবনবোধ ও অস্তিত্বসংগ্রামের বৃত্তান্ত রূপায়ণে কৃষ্ণ বিষয়ক পুরাণের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষণীয়। সমালোচকের অভিমত–

> বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কি টমাস মান, আলব্যায়ার কামু, টি.এস. এলিয়ট কিংবা মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-বুদ্ধদেব বসুর মতো সজাগ সতর্কভাবে সাহিত্য-প্রকরণ ও উপকরণ হিসেবে মিথ ব্যবহার করেছেন? সহজ উত্তর, হয়তো না। মিথ-কাহিনী বিভূতিভূষণে ব্যবহৃত হয়েছে সুপ্তিমগ্ন অবচেতনাসূত্রে। তাঁর সামূহিক নির্জ্ঞান (collective unconscious) স্তরের অস্থি-মজ্জাগত মিথ-কথার প্রত্নপ্রতিমা (archetype) সৃষ্টি-তাড়নায় জেগে উঠেছে শিল্পী-সত্তায়। এটি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এক বিস্ময়কর মনস্তাত্ত্বিক ধ্রুবসত্যমহিমা। Archetype-এর এই জ্ঞানে-নির্জ্ঞানে এবং জাতিচৈতন্যে ও সামূহিক নির্জ্ঞানে সজাগ সঞ্চরণশীলতা–ব্যাখ্যা-প্রতিপাদনের অতীত না হলেও, তা নিঃসন্দেহে মানব-মনস্তত্ত্বের এক কেন্দ্রীয় জটিলতা। (সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৮০)

উল্লেখপঞ্জি

অরূপরতন বসু [অনূ] (১৯৯৯)। *স্বপ্ন প্রতীক*। কলকাতা: দীপায়ন।

আনন্দ ঘোষ হাজরা (২০০৮)। *সাহিত্যবিচারে অবয়ববাদ, উত্তরাধুনিকতা এবং উপনিবেশবাদ*। কলকাতা: একুশ শতক।

আবদুল মান্নান সৈয়দ [সম্পা.] (২০১৮)। *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।

আশরাফ সিদ্দিকী (২০০৮)। *লোকসাহিত্য (প্রথম খণ্ড)*। ঢাকা: গতিধারা।

কল্পতরু সেনগুপ্ত ও অন্যান্য (সম্পা.) (২০০০)। *কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত [সম্পা.] (২০১৩)। *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

নীহাররঞ্জন রায় (২০০০)। *বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

পল্লব সেনগুপ্ত (২০১০)। *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।

পারভেজ হোসেন ও ফয়েজ আলম [সম্পা.] (২০০৬)। *জ্যাক দেরিদা: পাঠ ও বিবেচনা*। ঢাকা: সংবেদ।

বরুণকুমার চক্রবর্তী [সম্পা.] (২০১২)। *বাংলার লোকসংস্কৃতিকোষ*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স।

বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.] (২০১৩)। *ঠাকুরমা'র ঝুলি শতবার্ষিক সংস্করণ*। ঢাকা: অবসর।

মুহম্মদ নূরুল হুদা [সম্পা.] (২০০১)। *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা*। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট।

রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য [সম্পা.] (২০০৭)। *নজরুল-রচনাবলী জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (দ্বিতীয় খণ্ড)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রাজিয়া সুলতানা (২০০০)। *কথাশিল্পী নজরুল*। ঢাকা: নজরুল ইন্সটিটিউট।

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*। কলকাতা: প্যাপিরাস।

সমীর রায়চৌধুরী [সম্পা.] (গ্রন্থের প্রকাশকাল অনুল্লেখিত)। *অপর: তত্ত্ব ও তথ্য।* কলকাতা: হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী।

সালাহউদ্দিন আইয়ুব (১৯৯৮)। *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

সুধীরচন্দ্র সরকার [সং.] (২০০৮)। *পৌরাণিক অভিধান*। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সৈকত আসগর (১৯৯০)। *নজরুলের গদ্যরচনা: ভাবলোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা: অস্ট্রিক পাবলিশার্স।

সৈয়দ আকরম হোসেন (২০১০)। *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।